একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

মিথ্যাচার ও দুর্বৃত্তিতে শিরোপা-লাভ

হত্যা, ধর্ষণ বা চুরি-ডাকাতিই শুধু অপরাধ নয়, বরং বড় অপরাধ হলো মিথ্যা বলা ও তার প্রচার। খাদ্য দুষিত হলে তাতে স্বাস্থ্যহানী ঘটে, আচরণে বা জ্ঞানচর্চায় মিথ্যাচর্চা হলে তাতে আসে নৈতিক পচন। মহানবী (সাঃ) মিথ্যাচর্চাকে একারণেই সকল পাপের মা বলেছেন। কারণ,সকল পাপের জন্ম তো এ মিথ্যাচর্চা থেকেই। খুনি, ধর্ষণকারি, ঘুষখোর, চোর-ডাকাত ও ধোকাবাজ রাজনীতিবিদ -সবাইকে পদে পদে মিথ্যা বলতে হয়। খুন,ডাকাতি বা ধর্ষণের লক্ষ্যে বাড়ী থেকে বেরুনোর পরই যদি কোন দুর্বৃত্তকে এ প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যে সে কোথায় যাচ্ছে, এবং উত্তরে যদি সত্য কথা বলে তবে কি সে খুন,ডাকাতি ও ধর্ষণ করতে পারে? পদে পদে মিথ্যার সিঁড়ি বেয়েই প্রতিটি অপরাধীকে অপরাধের নানা পথে ছুটতে হয়। মিথ্যা বলা বন্ধ হলে পাপাচারও বন্ধ হয়ে যায়। হত্যা বা ধর্ষণের কারণে একটি জাতির মুখে অপমানের কালিমা ততটা লাগে না যতটা লাগে মিথ্যাচর্চায় ভেসে যাওয়ায়। বাংলাদেশে নৈতিক পচন ও দুর্বৃত্তিতে দেশটির পাঁচবার শিরোপা পাওয়ার যে বিশ্বজোড়া পরিচিতি সেটি একাত্তরে গণহত্যা ও নারীর ধর্ষণের কারণে জুটেনি। বরং সেটি সত্যহত্যা বা সত্যধর্ষণের কারণে।

এবং সেটি অর্জিত হয়েছে দেশের রাজনৈতিক নেতা, প্রশাসনিক কর্মকর্তা, বুদ্ধিজীবী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, আইনবিদ, শিক্ষক ও সাধারণ মানুষদের দ্বারা ব্যাপক মিথ্যাচর্চায়। তাদের চেষ্টায় এ চারিত্রিক মহাব্যাধী এখন এক ভয়াবহ মহামারিতে পরিণত হয়েছে।

মিথ্যাচর্চায় যেটি অসম্ভব করে তুলে সেটি সত্য ও ন্যায়নীতির বেড়ে উঠাটি। মিথ্যাচর্চায় অভ্যস্থ ব্যক্তিটি অভ্যস্থ হয় নানারূপ অপরাধে।এদের কারণেই দেশে বলবান হয় দূর্নীতি।অথচ মিথ্যাচর্চাই বাংলাদেশে বিদ্যাশিক্ষা, ইতিহাস-চর্চা এবং সে সাথে জাতীয় সংস্কৃতির প্রবলতর দিক। বাংলাদেশের একজন ছাত্রকে তার স্কুল জীবনের শুরু থেকে যে কথাটি বার বার উচ্চারণ করতে হয় তা হলো, তিরিশ লাখ বাঙ্গালী হত্যা ও তিন লাখ ধর্ষণের ন্যায় প্রকান্ড মিথ্যাটি। স্কুল-কলেজে পবিত্র কালেমা পাঠেও এতটা উৎসাহিত করা হয় না,যা করা হয় এ মিথ্যাকথাটি বলাতে। ছাত্ররা এভাবেই মিথ্যাবলায় লাগাতর প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। অথচ ৩০ লাখ হত্যা ও তিন লাখ ধর্ষণের বিষয়টি একটি অভিযোগ মাত্র, যা মুজিব উত্থাপণ করেছিল তার বিরুদ্ধ-পক্ষের বিরুদ্ধে। অথচ কোনরূপ তদন্ত না করেই এ অভিযোগকে সত্যের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং পাঠ্য-পুস্তকে ঢুকানো হয়েছে। কথা হলো, মিথ্যার প্রচারকে এভাবে এতটা বলবান করে মসজিদ-মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠা বা কোরআন-হাদীসের পাঠ বাড়িয়ে কি লাভ হবে? বাড়বে কি সততা ও ন্যায়পরায়নতা? বাংলাদেশে মসজিদ-মাদ্রাসার সংখ্যা কি কম? দিন দিন তো সেগুলো বেড়েই চলেছে। কিন্তু তাতে কি দূর্নীতি কমছে? বরং যতই বাড়ছে মসজিদ-মাদ্রাসা, ততই বাড়ছে দূর্নীতি। সততা বাড়াতে হলে নবীজী (সাঃ)র পথ ধরতে হয় এবং সেটি হলো, আপোষহীন হতে হয় সত্য গ্রহনে এবং মিথ্যা পরিহারে। বিশ্ববাসীর কাছে মিথ্যা চর্চায় কি সম্মান বাড়ে? মাথার উপর মিথ্যার স্তুপ নিয়ে কখনই কি কেউ মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে? বাড়ে কি মহান আল্লাহর কাছে গ্রহনযোগ্যতা? সমাজে চোর-ডাকাত রূপে চিত্রিত হওয়ার অপমান অনেক। প্রচন্ড অপমান বিশ্ব মাঝে মিথ্যার প্রচারক রূপে পরিচিত হওয়াতেও। মিথ্যা-পরিহার তাই প্রতিটি দেশপ্রেমিক ও সত্যপ্রেমিক নাগরিকের নৈতিক দায়বদ্ধতা।তবে মিথ্যা পরিহারে জন্য জরুরী হলো,প্রথমে সে প্রচলিত মিথ্যাগুলোকে খুঁজে বের করা। বস্তুতঃ আলোচ্য নিবন্ধটি লেখা হয়েছে তেমনই এক দায়বদ্ধতা থেকে।

অপরাধ যেখানে সত্য-গোপনের

হত্যা, ধর্ষণ বা যেকোন অপরাধের মুখে ব্যক্তি ও জাতির দায়বদ্ধতা হলো সত্য ঘটনাকে তুলে ধরা। এ নিয়ে মিথ্যা রটনা বরং নিজ চরিত্রে কলংক যোগ করে।যে কোন দেশে শান্তিকালীন অবস্থাতেও ধর্ষণ হয়। আর যুদ্ধকালীন সময়ে -বিশেষ করে গৃহযুদ্ধের সময়, ধর্ষণ যে বেড়ে যাবে সে সম্ভাবনাই অধিক। কারণ, লোভ-লালসা,ক্ষুধা ও অর্থের মোহয়ের ন্যায় যৌনক্ষুধাও মানুষের মজ্জাগত। প্রতিহিংসা পরায়ণ মানুষের মাঝে সেটি আরো বেড়ে যায়। আর যুদ্ধ তো সে প্রতিহিংসাকেই ভয়ানকভাবে বাড়িয়ে দেয়।সে ক্ষুধা পুরণের সামর্থ বহু গুণ বেড়ে যায় যদি সে দুর্বৃত্তটি হাতে অস্ত্র পায়। অস্ত্রধারি লোকদের এজন্যই জনপদে নামানো চরম বিপদজনক। ব্রিটেনের মত বহুদেশে এজন্যই পুলিশদের হাতে অস্ত্র দেওয়া হয় না,তাদেরকে রাস্তায় নামানো হয় খালি হাতে। অথচ একাত্তরে হাজার হাজার লোকের

1 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

হাতে অস্ত্র পৌঁছে যায়। শুধু পাক-আর্মির সৈনিকদের হাতেই নয়, হাজার হাজার বাঙ্গালী যুবকদের হাতেও। তাদের মধ্যে অনেক দুর্বৃত্তও ছিল। তখন দেশে নিরস্ত্র বাঙ্গালীর পাশাপাশি বহু লক্ষ নিরস্ত্র অবাঙ্গালীও ছিল। ফলে ধর্ষণ দুই পক্ষেই হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের ইতিহাসে একপক্ষের বিবরণ এসেছে। অন্যপক্ষের নেই। সত্যের সাথে প্রচন্ড অবিচার হয়েছে এক্ষেত্রটিতে। যেকোন বিবেকমান মানুষের চোখে এমন পক্ষপাত-দুষ্টতা অতি সহজেই ধরা পড়ে। আর এতে পক্ষপাতদুষ্ট সমগ্র ইতিহাস গিয়ে পড়ে আস্তাকুঁড়ে। অবিরাম মিথ্যা বলে সাময়িক ভাবে কিছু লোককে বিভ্রান্ত করা যায়, কিন্তু সে মিথ্যাকে কখনই বিবেকের আদালতে বিজয়ী করা যায় না। তিরিশ লাখ মানব-হত্যার ন্যায় তিন লাখ নারী-ধর্ষণের বিষয়টিও তাই বিশ্ববাসীর কাছে গ্রহনযোগ্য হয়নি। তারাও জানে এটি allegation, facts নয়। মুজিব সরকার ও তার সমর্থনকারি বুদ্ধিজীবীরা এমন কোন প্রমাণও রাখতে পারেনি যা দিয়ে এ সংখ্যাকে সমর্থণ করা যায়। বিবেকের আদালত মজলুম মানুষকে পূর্ণ অধিকার দেয় নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরার, কিন্তু অধিকার দেয়না মিথ্যা বলার। বিষয়টি নিয়ে কতটা সত্য বা মিথ্যা বলা হলো সেটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।কারণ তা থেকেই নির্ণীত হয় ব্যক্তির চরিত্র। অভিযোগ খাড়া করলেই সেটি facts বা সত্যে পরিণত হয় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও অসংখ্য আদালতে বহুশত বিচারক বসে আছে এরূপ অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ে। কিন্তু মুজিব সরকার যে অভিযোগটি তুলেছিল সেটি যাচাইয়ে কোন বিচার বসেনি। কোন বিচারকের নেতৃত্বে তদন্ত কমিশনও গঠিত হয়নি। গ্রাম-গঞ্জ থেকে কোন পরিসংখ্যানও সংগ্রহ করা হয়নি। অথচ ধর্ষণের এ বিশাল সংখ্যাটিকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে ইতিহাসে লিপিবদ্ধ করা হযেছে।

তবে নারী ধর্ষন যে হয়েছে তা নিয়ে বিতর্ক নেই। এমনকি পাকিস্তান আর্মি ও সেদেশের সরকারও সেটি অস্বীকার করেনা। পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামদুর রহমানের নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হয়েছিল সে তদন্ত কমিটি সেটি স্বীকারও করেছে। (Government of Pakistan (1971) বিতর্ক হলো মূলতঃ তিনটি বিষয়ে। এক) ধর্ষণের সংখ্যা কত?
দুই) কারা সে ধর্ষণের শিকার?
তিন) এ ধর্ষণে কি সরকারি ভাবে পরিকল্পিত ছিল, না কি দুই পক্ষেরই সুযোগ-সন্ধানী সশস্ত্র দুর্বত্তরা মওকা বুঝে নারী ধর্ষণের সুযোগ নিয়েছে?

এ বিষয়গুলো বাংলাদেশের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিয়য়।দেশের ইতিহাসকে মিথ্যামুক্ত করার স্বার্থে সুষ্ঠ পরিসংখ্যান সংগ্রহ জরুরী ছিল। শুধু বিদেশীদের জন্যই নয়, নিজেদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে এ ইতিহাসকে গ্রহণযোগ্য করার স্বার্থেও এমন পরিসৃংখ্যান অপরিহার্য। কিন্তু শেখ মুজিব ও তার সরকার এ নিয়ে তদন্তের কোন প্রয়োজনীয়তাও অনুভব করেনি। কোন রূপ গবেষণা বা তদন্ত না করেই মুজিব সরকার উপরের তিনটি প্রশ্নেরই তড়িৎ জবাব দিয়েছে। সেগুলো হলো-
এক) ধর্ষিতা হয়েছে তিন লাখ। দুই) যারা ধর্ষিতা হয়েছিল তারা ছিল বাঙ্গালী। তিন) নারীধর্ষন হয়েছে পরিকল্পিত ভাবে এবং পাকিস্তান সরকারের কেন্ত্রীয় নীতির অংশরূপে।

অথচ এ তিনটি জবাবের কোনটিই সত্য নয়। আন্তর্জাতিক মহলে সত্য বলে তা গৃহীতও হয়নি। শুধু ধর্ষণের সংখ্যাটিই মিথ্যা নয়, যারা ধর্ষিতা হয়েছিল তারা যে সবাই বাঙ্গালী ছিল সেটিও মিথ্যা। বহু আবাঙ্গালী নারীও সেদিন দুর্বৃত্তদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছিল।অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসে সেটির কোন উল্লেখই নেই।বাঙ্গালী নির্মূল বা বাঙ্গালী রমনীদের ধর্ষণের বিষয়টি যে পাকিস্তান সরকারের আদৌ কোন সরকারি নীতি ছিল না সেটি জানা যায় পাক-আর্মির পূর্ব-পাকিস্তান কমান্ডের অধিনায়ক লে.জেনারেল নিয়াজীর লেখা চিঠিতে, যা তিনি লিখেছেন ফিল্ড কমান্ডারদের উদ্দেশ্য করে।পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যদের দ্বারা নানা স্থানে হত্যা ও ধর্ষণের বিবরণ তখন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দফতরে পৌঁছে। তখন জেনরেল নিয়াজী চিঠি লেখেছেন সেনাদের মধ্যে শৃঙ্খলা ও নৈতিকতা ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিয়ে। অথচ আওয়ামী পক্ষের দাবী, বাঙ্গালীদের নির্মূল করা এবং বাঙ্গালী মহিলাদের ধর্ষণ করাই পাকিস্তান আর্মির অফিসিয়াল পলিসি এবং পাকিস্তানপন্থি নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে এ দলটির নেতারা অভিযোগ তুলেছিল তারা নাকি সেনানীবাসে ও আর্মী অফিসারদের বাসায় নারী সরববরাহ করতো। জনাব নুরুল আমীন, গভর্নর মালেক, জনাব গোলাম আযম, জনাব সবুব খান, মৌলভী ফরিদ আহমদের মত ব্যক্তিদেরও সে অভিযোগ থেকে রেহাই দেয়নি। রাজনৈতিক নেতাদের পাশা পাশি একই অভিযোগ এনেছিল শান্তিকমিটির বহু সদস্য, মসজিদের বহু ইমাম ও মাদ্রাসার বহু শিক্ষকের বিরুদ্ধেও। এদিক দিয়ে আওয়ামী নেতাকর্মী ও তাদের সহযোগীদের লক্ষ্য ছিল দু’টি,
এক) পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অফিসারদের সাথে ইসলামপন্থি ও পাকিস্তানপন্থিদের চরিত্রহনন,

2 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

দুই) নিজেদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী রূপে তুলে ধরা।

যুদ্ধ একাকী আসে না

যে কোন দেশে যুদ্ধ একাকী আসে না। সাথে আনে ব্যাপক হত্যা, ধর্ষণ ও ধ্বংস। একাত্তরে বাংলাদেশে এমনই একটি যুদ্ধের আগমন ঘটেছিল। আর সে যুদ্ধ নিজে নিজেই আসেনি, বরং পরিকল্পিতভাবে সেটিক ডেকে আনা হয়েছিল। যুদ্ধ শুরুর লক্ষ্যে পরিকল্পনা, প্রচরনা, অর্থায়ন ও প্রশিক্ষণের কাজ শুরু হয়েছিল একাত্তরের অনেক আগেই এবং সেটি প্রতিবেশী দেশ ভারতের সহযোগিতা নিয়ে। বাংলাদেশের ইতিহাসের নানা বিতর্কিত বিষয়ের মাঝে এটি এমন এক বিষয় যা নিয়ে কারো মাঝে কোন বিতর্ক নেই বরং আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা তা নিয়ে আজ গর্ববোধ করে। তাই একাত্তরে বাংলাদেশের মাটিতে যত হত্যা, ধর্ষণ ও জুলুম হয়েছে তা ছিল একটি প্রকান্ড যুদ্ধেরই ফলশ্রুতি। তাই এজন্য শুধু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর দোষ চাপালেই সুবিচার হবে না। দায়ী তো তারা যারা যুদ্ধকে ডেকে আনে বা অনিবার্য করে তুলে। বাংলাদেশে তেমন একটি যুদ্ধ শুরু করেছিল আওয়ামী লীগ এবং সেটি ২৫ মার্চের আগেই। এমন একটি যুদ্ধের প্রস্তুতিতেই শেখ মুজিব আগড়তলা গিয়েছিলেন এবং বাংলাদেশের ইতিহাসেও এ নিয়েও কোন বিতর্ক নেই। তাদের বড় অপরাধ, নিছক ক্ষমতার লোভে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশকে খন্ডিত করার। বাঙ্গালী জাতিয়তাবাদের ভূত বাঙ্গালীর মাথা থেকে নামার সাথে সাথে এ অপরাধে তাদের বিচার বসবে। সে বিচারে নিজেদের অপরাধকে জায়েজ করতেই তারা পাকিস্তানী সেনাবাহিনী ও অখন্ড পাকিস্তানের সমর্থকদের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছে। দেশভাঙ্গার অপরাধকে তারা পাক-বাহিনীর জুলুমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বলে জায়েজ করতে চেয়েছে। অথচ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যুদ্ধ শুরু না হলে পাকিস্তান আর্মির গ্রামে গঞ্জে নামার প্রয়োজনই ছিল না। পূর্ব পাকিস্তানে পাক আর্মির আগমন হঠাৎ করে ঘটেনি। এখানে তারা ২৩ বছর যাবত ছিল। তারা এদেশের নগরে ব্ন্দরে ঘুরেছে, ২৩ বছর সীমান্ত পাহারা দিয়েছে। যদি পাক-সেনারা এতটাই হত্যা ও ধর্ষণ-পাগল হত তবে ২৩ বছর ধরে সেটি লাগাতর ঘটতো, যেমনটি আফগানিস্তান ও কাশ্মিরে আগ্রাসী মার্কিন ও ভারতীয় বাহিনীর সদস্যদের হাতে বছরের পর বছর ধরে হচ্ছে।

মুজিব ও তার সরকারের মনযোগ ছিল নিছক মিথ্যাপ্রচারে, এজন্যই তদন্তে হাত দেয়নি। তাতে তার আগ্রহও ছিল না। তিনি যেন পরিসংখ্যান নিয়ে কোন প্রকান্ড বিষয় লুকাতে চাচ্ছিলেন। তার ভয় ছিল, এমন একটি তদন্তে সে বিষয়টি এবং সে সাথে তার সরকারের মিথ্যাচারিতা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণিত হয়ে যাবে। বিশ্বের তাবত মিথ্যাচারি দুর্বৃত্ত্বরা নিরপেক্ষ তদন্তকে এজন্যই যমের মত ভয় করে। একাত্তরের ঘটনা নিয়ে এজন্যই বাংলাদেশে আজও কোন বিচার বিভাগীয় তদন্ত হয়নি। অথচ তেমন একটি তদন্ত পাকিস্তানে হয়েছে। সে কমিশনের প্রধান ছিলেন পাকিস্তানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি জনাব হামদুর রহমান, যিনি ছিলেন একজন পূর্ব-পাকিস্তানী বাংলাভাষী। তদন্ত রিপোর্টে তিনি লিখেছেন,“বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষের বক্তব্য মতে ৩০ লাখ বাঙ্গালী হত্য এবং ২ লাখ পূর্ব পাকিস্তানী মহিলাদের ধর্ষণের জন্য পাকিস্তান আর্মি দায়ী। কোনরূপ বিষদ যুক্তিতর্ক ছাড়া বলা যায় এ সংখ্যা অতিশয় অতিরঞ্জিত। এমন ক্ষয়ক্ষতি পূর্ব পাকিস্তানে মোতায়েনকৃত পাকিস্তান আর্মির সকল জনশক্তির পক্ষেও সাধন করা অসম্ভব এমনকি যদি তাদের জন্য অন্য আর কিছু করার নাও থাকতো। অথচ বাস্তবতা ছিল পাকিস্তান আর্মির সৈন্যদের অবিরাম লড়াই করতে হচ্ছিল মুক্তি বাহিনীর বিরুদ্ধে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারিদের বিরুদ্ধে এবং পরবর্তীতে হানাদার ভারতীয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এছাড়াও তাদের চালাতে হচ্ছিল পুরা একটা সিভিল প্রশাসন, চালু রাখতে হচ্ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং খাদ্য জোগানোর ব্যবস্থা করতে হচ্ছিল ৭ কোটি মানুষের। সুতরাং এ বিষয়টি সুস্পষ্ট- হত্যা ও ধর্ষনের যে সংখ্যা বাংলাদেশ কর্তৃপক্ষ পেশ করেছে তা সম্পূর্ণ “fantastic and fanciful.”- (Government of Pakistan (1971)”

একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে জনসংখ্যা ছিল সাড়ে সাত কোটি। একাত্তরের শুরুতে পাকিস্তানের এ প্রদেশটিতে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র বিশ হাজার। -(FRUS, Vol XI p11 & 25) এ সংখ্যা একাত্তরে ডিসেম্বরে এসে ৩৪ হাজারে পৌঁছে। পরে আরো ১১ হাজার –যারা ছিল সিভিল পুলিশ এবং non-combatant personnel-তাদেরকে নিয়ে আসা হয়। অর্থাৎ সর্বোসাকুল্যে এ সংখ্যা ছিল ৪৫ হাজার। -(Niazi, Lt Gen AA K, 2002) যুদ্ধ চলেছিল ২৬শে মার্চ থেকে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত সর্বোমোট ২৬৫ দিন ধরে। পাকিস্তানে আর্মির ৪৫ হাজার সৈনিক ৩ বা ৪ লাখ নারীকে ধর্ষণ করেছে সেটি কতটা বিশ্বাসযোগ্য? মাত্র ২৬৫ দিনের যুদ্ধে ৩০ লাখ মানুষকে হত্যা আর তিন লাখ নারীকে ধর্ষিতা করতে হলে পাকবাহিনীর সৈন্যদেরকে সেটি করতে হতো অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে যা কেবল কান্ড জ্ঞান শূণ্য ব্যক্তিই বিশ্বাস করতে পারে। তাদের পক্ষে নদ-নদী, হাওর-বাওরে ভরা বাংলাদেশের প্রায় ৭০ হাজার গ্রামের মধ্যে প্রতিটি দশটির মাঝে একটিতেও কি পৌঁছা সম্ভব হয়েছিল? প্রতিটি গ্রাম দূরে থাক তারা প্রতিটি ইউনিয়নেও পৌছেতে

3 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

পারিনি। হিটলারের অনেকগুলো গ্যাস চেম্বারও এত দ্রুত ইহুদী হত্যা করতে পারেনি। বলা হয়ে থাকে,হিটলার ৬০ লাখ ইহুদী হত্যা করেছিল। কিন্তু তাকে সে কাজ সমাধা করতে অনেকগুলো বছর লেগেছিল। মুজিবভক্তরা নিজেদের দলীয় ক্যাডার ও ভারতীয় বন্ধুদের ছাড়া আর কাউকে কি দিয়ে এমন মিথ্যা কাহিনী বিশ্বাস করাতে পেরেছে?

বিদেশী পত্রিকায় একাত্তরের ধর্ষণ

একাত্তরের নারীধর্ষণ বনাম সত্যধর্ষণ নিয়ে বাংলাদেশে শত শত বছর ধরে আলোচনা হবে। একাত্তরের পর থেকে আজ অবধি বাংলাদেশের বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে যে সন্ত্রাস তারা প্রতিষ্ঠা করেছে সেটিও চিরকাল থাকবে না। বাংলাদেশের ইতিহাসবিদ ও বুদ্ধিজীবীগণ যেহেতু এক্ষেত্রে কোন নিরপেক্ষ সত্য বিবরণ দিতে পারেনি তাই যারা প্রকৃত ঘটনাকে জানতে চায় তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলো বিদেশী সাংবাদিকদের সে সময়ের রিপোর্ট। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে এপ্রিলের ১৬-১৭ তারিখ পর্যন্তু সমগ্র বাংলাদেশ ছিল মূলতঃ আওয়ামী লীগের ক্যাডারদের দখলে। সে সময় সমগ্র দেশে সবচেয়ে অরক্ষিত ছিল লক্ষ লক্ষ অবাঙ্গালী পরিবার। তাদের দোকান-পাঠ ও ঘরবাড়ী লুটতে সেদিন হাজার হাজার দুর্বৃত্ত রাস্তায় নেমে এসেছিল। তারা যে সেদিন তাদের সহায়সম্পদ লুটেই ক্ষান্ত দিয়েছিল তা নয়। দুর্বত্তদের এটিই একমাত্র দুষ্কর্ম নয়। সম্পদের মোহই তাদের একমাত্র মোহ নয়। তাদের প্রচন্ড আকর্ষণ ছিল ধর্ষণেও। দুর্বৃত্তদের কাছে ধর্ষণও যে কতটা উৎসবযোগ্য সেটির প্রমাণ মেলে বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে ধর্ষণের উৎসব দেখে। নব্বইয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে তেমন একটি উৎসব করেছিল জাহাঙ্গিরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগপন্থি ছাত্র লীগের এক নেতা। সে উৎসব করেছিল ধর্ষণে সেঞ্চুরি করার পর। তৎকালীন ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার এমন এক স্বঘোষিত দুর্বৃত্তকে কোন শাস্তি দেয়নি। চুরি-ডাকাতির ন্যায় ধর্ষণ প্রতি দেশে প্রতি দিনই ঘটে, কিন্তু তা নিয়ে কোন পতিতাপল্লি বা সন্ত্রাসী পল্লিতে নয়, একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশ্যে উৎসব হবে সেটি কি কল্পনা করা যায়? বর্বরতার এটি এক অভাবনীয় মাত্রা। ফলে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাতে সে প্রকান্ড কুৎসিত খবরটি সেদিন শিরোনাম পেয়েছিল। আর একাত্তরে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের এমন অসংখ্য কর্মীদের হাতেই অস্ত্র গিয়ে পৌঁছে। তাছাড়া দেশের জেলগুলির দরজা খুলে মুক্ত করে দেওয়া হয় দুর্বৃত্তদের। তারা হাতে অস্ত্র পেয়ে যায়। আর এসব সশস্ত্র দুর্বৃত্তরা সেদিন লুটের সাথে ধর্ষন এবং হত্যাতেও নামে। তাদের টার্গেট ছিল অবাঙ্গালী মহিলারা ও তাদের পরিবার। মুজিব সরকারের কোন সরকারি রিপোর্টে বা বাংলা-সাহিত্য ও বাংলাদেশের ইতিহাসে সেরূপ শত শত অপরাধের কোন বিবরণ নেই। বরং যা আছে তাদেরকে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী বলে চিত্রিত করার প্রচেষ্ঠা। অথচ সে অপরাধ যে কতটা বর্বরতার সাথে হয়েছিল সে বিবরণ পাওয়া যায় বিদেশীদের রিপোর্ট পড়ে। তারা সেদিন কি লিখেছিল তার কিছু নমুনা দেয়া যাক।

লন্ডনের “সানডে টাইমস” সেদিন লিখেছিলঃ প্রত্যক্ষদর্শীর ৮০টি সাক্ষাৎকার থেকে ধর্ষণ, নির্যাতন, চক্ষু উৎপাটন, মেয়েদের স্তন কেটে ফেলা, হত্যার আগে হাত-পা কেটে ফেলার মত লোমহর্ষক কাহিনী পাওয়া গেছে। …পাঞ্জাবী সৈনিক ও বেসামরিক অফিসার এবং পরিবারদেরকে বিশেষ নৃশংসতা চালানোর জন্য আলাদা করে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম মিলিটারি একাডেমীর কর্নেল কমান্ডিং অফিসারের স্ত্রী ধর্ষিতা ও নিহত হন এবং তাকেও হত্যা করা হয়। চিটাগাং এর অন্য অংশে একজন ইপিআর অফিসারের শরীরের চামড়া জীবন্ত তুলে ফেলা হয়। তার দুই ছেলের মাথা তার নগ্ন দেহে তুলে দিয়ে মৃত্যুর জন্য ছেড়ে দেয়া হয়।…অনেক তরুণীর মৃতদেহ পাওয়া যায় যাদের পেটে বাংলাদেশের পতাকাদন্ড পোঁতা ছিল। …সরকারি হিসেব অনুসারে চট্টগ্রামে ৯ হাজার মারা যায়। খুলনার সংখ্যাও অনুরূপ। হত্যাকান্ড অন্যান্য জায়গাতেও ঘটেছে। ঠাকুরগাঁয়ে তিন হাজার নারী-শিশু নিহত হয়। এইভাবে নিহত হয় ঈশ্বরদিতে ২ হাজার, ভৈরববাজারে ৫ শত, কালুর ঘাট জুটমিল শেডে ২৫৩ জন। …ব্যাহ্মণবাড়িয়ায় গুলী করে হত্যা করা ৮২টি শিশুর লাশ দেখি। আর তিন শতটি লাশ দেখি জেলের আশেপাশে যাদেরকে বাঙালী বন্দীদের জেল ছেড়ে চলে যাবার পর জেলে আটকে রাখা হয়েছিল। পাক-সৈন্যরা ব্রাহ্মণবাড়িয়া আসার আগে এদের হ্ত্যা করা হয়। -(Anthony Mascarenhas, The Sunday Times, May 2, 1971) পত্রিকাটি আরো প্রকাশ করে, “পূর্ব পাকিস্তানী (বাঙ্গালী) মিলিটারি ও প্যারামিলিটারি সৈন্যরা বিদ্রোহ করে এবং অবাঙ্গালীদের উপর অতি বর্বর ভাবে হামলা করে। যেসব হতভাগা মুসলমানদের হাজার হাজার পরিবার ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বিহার থেকে এসে পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছিল তাদেরকে অতি নির্দয় ভাবে নির্মূল করা হয়েছিল। নারীদের ধর্ষণ করা হয়েছিল অথবা তাদের স্তনকে বিশেষ প্রকারের ধারালো ছুরি দিয়ে কর্তন করা হয়েছিল। শিশুরাও সেদিন সে বীভৎসতা থেকে রেহাই পায়নি। যারা সেদিন ভাগ্যবান ছিল তারা তাদের পিতামাতাদের সাথে নিহত হয়েছিল।”-(Anthony Mascarenhas, The Sunday Times, June 13, 1971)

ওয়াশিংটন পোষ্ট লেখে, “বন্দর নগরী চট্টগ্রাম সফরকারী সাংবাদিকরা ব্যাপক বেসামরিক লোকহত্যার চিহ্ন দেখতে

4 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

পায়। ইস্পাহানী জুটমিলের বিনোদন ক্লাবে ১৫২ জন অবাঙ্গালী নারী-শিশুকে হত্যা করা হয়। বুলেটে ক্ষত-বিক্ষত করে রক্তমাখা কাপড়ের স্তুপ, শিশুদের খেলনা তখনও পড়ে থাকতে দেখা যায়। …অধিবাসীরা একটা পোড়া বাড়ি দেখিয়ে বলে ৩শ পাঠানকে সেখানে পুড়িয়ে মারা হয়েছে।- (The Washington Post, May 12,1971) “নির্যাতন করার পর হাজার হাজার অবাঙ্গালীকে খুলনায় হত্যা করা হয়। …বিহারীদের যে বন্দীখানায় রাখা হয় সাংবাদিক সেটি দেখানো হয়। রক্তমাখা কাপড়-চোপড়, মেয়েদের চুল ইতস্তত ছড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।” -(The Sun, Singapore May 9, 1991) নিউওর্ক টাইমস লেখে, “...চট্টগ্রামে পাক-সৈন্য পৌঁছার আগ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ এবং তাদের সহযোগী বাঙ্গালী শ্রমিকেরা, যারা অপেক্ষাকৃত সচ্ছল বিহারীদের প্রতি ঈর্ষাপরায়ন ছিল, বিহারীদের বিপুল সংখ্যায় হত্যা করে। …একটি স্থানীয় ব্যাংকের ইউরোপীয় ম্যানেজার বললেন, প্রত্যেক ইউরোপীয়দের এটা সৌভাগ্য, সৈন্যরা ঠিক সময় এসে গিয়েছিল। তা না হলে এই কাহিনী বলার জন্য আমি জীবিত থাকতাম না।” –(The New York Times, May 11, 1971)

লন্ডনের দি গার্ডিয়ান রিপোর্ট ছেপেছিল, “সে এক মহা আতংকের খবর শুনি।হত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংস, ব্যাপক লুটতরাজ –এসব ঘটনা এত বেশী হয় যে আতংকে অভিভূত হয়ে যেতে হয়। অসহায় বিহারীরাই এর প্রধান শিকার। …কিন্তু কত সংখ্যায় বিহারীরা নিহত হয়েছে সেটা প্রকৃত দুর্ভাগ্যের ব্যাপার নয়। কতটা বিচিত্র কায়দায় তাদের মারা হয়েছে সেটাই আসল। …বিহারীদের হত্যাখানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং ছুরি দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের হত্যা করা হয়েছে। …একজন গর্ভবতী মহিলাকে রাস্তায় টেনে নিয়ে যাওয়া হয়। তার পেট কেটে ছেলেকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে মারা হয়। ..একজন মহিলাকে মেরে ফেলা হয়, কিন্তু তার ৩ মাসের শিশুকে একটা হাত কেটে ফেলে বাঁচিয়ে রাখা হয়। …একজন ডাক্তার সিরিঞ্জ দিয়ে লোকদের দেহ থেকে সব রক্ত শুষে নিয়ে তাদের মৃত্যুর পথে ঠেলে দেয়। -(The Guardian, May 10, 1971)

বিদেশীদের গবেষণায় একাত্তরের ধর্ষণ

তিন লাখ নারীর ধর্ষণের প্রচার শুনে বিদেশীরা নেমেছিল বিষয়টি কতটুকু সত্য সেটির অনুসন্ধানে। কিন্তু তারাও অবাক হয়েছে মিথ্যার প্রচন্ডতা দেখে। তাদের গবেষণায় যেটি প্রমাণ হয় তা হলো, বাংলাদেশে একাত্তরে যতটা নারী-ধর্ষণ হয়েছে তার চেয়ে বহুগুণ বেশী হয়েছে সত্যধর্ষণ। ফলে দেশের ইতিহাসচর্চায়,বিদ্যালয়ে ও জনপদে যেটি সবচেয়ে বেশী মারা পড়েছে সেটি হলো সত্য। এসব গবেষকদের অনেকে ধর্ষণের প্রকৃত ঘটনাগুলোর একটি বাস্তব তথ্য সংগ্রহে বাংলাদেশের গ্রামে-গঞ্জে ঘুরেছেন, গ্রামে গ্রামে গিয়ে মহিলাদের সাথে কথা বলেছেন, যা বাংলাদেশী কোন সরকারি কর্মকতা বা গবেষক করেনি। অনেকে পাকিস্তানের গিয়ে একাত্তরে যারা সেনা-অফিসার ছিলেন তাদের সাথেও কথা বলেছেন। শর্মিলা বোস তেমন গবেষকদেরই একজন। শর্মিলা বোস বংশ সূত্রে নেতাজী সুভাস বোসের বংশধর। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি করেছেন এবং অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০০৮ সালে ডিপার্টমেন্ট অব পলিটিক্স বিভাগে একজন গবেষক ছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute for the Study of Journalism এর তিনি ডিরেক্টর ছিলেন। একসময় তিনি কোলকাতার আনন্দ বাজার পত্রিকার সহকারি সম্পাদকও ছিলেন। বাংলাদেশে গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের উপর লেখা নিবন্ধ বিদেশী জার্নালে ছাপাও হয়েছে। নারী ধর্ষণ নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণার পর তার মনে এ ধারণা দৃঢ়মূল হয়, বাংলাদেশে একাত্তরে নারীধর্ষন ঠিকই হয়েছে। তবে এতে শুধু বাঙ্গালী রমনীরা ধর্ষিতা হয়নি বরং বিপুল সংখ্যক অবাঙ্গালী মহিলারা বাঙ্গালীদের হাতে ধর্ষিতা হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের ইতিহাসের বইয়ে তার কোন উল্লেখই নেই।

ধর্ষন নিয়ে ড. শর্মিলা বোস তার নিজের গবেষণায় যে উপসংহারটি টেনেছেন তা হলো,“একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তানে ঘটে যাওয়া কয়েকটি ঘটনার মাঠ পর্যায়ের গবেষণায় আমি দেখলাম, বাংলাদেশী অংশগ্রহণকারিগণ এবং যারা ঘটনা প্রত্যক্ষদর্শী ছিল তারা যুদ্ধের বর্ণনা দিল। গুলি করে হত্যার বর্ণনাও দিল। কিন্তু তারা আমাকে একথাও বললো,“আর্মি মহিলাদের কোন ক্ষতি করেনি। তবে যদি কেউ দুর্ভাগ্যক্রমে ক্রস ফায়ারে পড়ে যায় তবে অন্যকথা।” একাত্তরে ধর্ষনের যে বিশাল সংখ্যা তুলে ধরা হয়েছিল সে প্রেক্ষিতে এটি আমার কাছে বিস্ময়কর লেগেছে। আমার কেস স্টাডিজে আমি একটি মাত্র ঘটনারও প্রমাণ পেলাম না।–(Bose, Sarmila: 2005)।

শর্মিলা বোস আরো লিখেছেন,“একাত্তরের যুদ্ধের উপর প্রকাশনার উপর গবেষণা করতে গিয়ে দেখলাম ২ লাখ থেকে ৪ লাখ ধর্ষিতার যে সংখ্যা বাংলাদেশে বলা হয় তার হিসাব নিকাশের কোন ভিত্তি নেই। এটি অবশ্যই অপ্রত্যাশিত নয় যে ভূক্তভোগীদের সংখ্যার একটি estimate করা হবে। তবে প্রতিটি estimate এর মূলেও মাঠ পর্যায়ের কিছু সাক্ষী প্রমাণ থাকতে হয় যার ভিত্তিতে একটি পরিসংখ্যান বের করা যায়। কিন্তু বাংলাদেশে একাত্তরে তেমন কিছুই ছিল না। এ

5 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

ব্যাপারে কোন সরকারি পরিসংখ্যানও নাই। পরিসংখ্যানের একটা বিশ্বাসযোগ্য ভিত্তি হতে পারতো মাঠপর্যায়ের তদন্ত, ক্ষতিপূরণ এবং পুনঃবাসনের ক্ষতিপুরণ থেকে। পুনঃবাসন কেন্দ্রগুলির যে তথ্য প্রকাশ পেয়েছে সেগুলো্ বরং বাংলাদেশ সরকারকে আরো বিপদে ফেলেছে। সেগুলো ইঙ্গিত দেয়, সরকার কি যেন লুকাচ্ছে। সরকার ধর্ষিতার যে সংখ্যা পেশ করেছে তা পুনঃর্বাসন কেন্দ্রগুলোর তথ্য থেকে আদৌ প্রমানিত হয় না।”

একাত্তরের ঘটনার উপর ১৯৭১ সালের আগষ্টে পাকিস্তান সরকার একট শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। সেখানে অবাঙ্গালীদের উপর বাঙ্গালীদের দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানব্যাপী নৃশংস হত্যাকান্ড ও ধর্ষণের ঘটনার উল্লেখ করে। -(GOP 1971) শর্মিলা বোস তার গবেষণার কাজে পাকিস্তান গিয়েছিলেন, সেখানে সেনাকর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। বাংলাদেশে তার গবেষণাটি পরিচালিত হয় যশোর, খুলনা, ময়মনসিং এবং চট্টগ্রামে যেখানে অবাঙ্গালী নারী-পুরুষ ও শিশুদের উপর হত্যা ও নৃশংস ঘটনা ঘটেছে। পাক আর্মির একজন সিনিয়র জেনারেল এম.এ.ও.মিঠা (M. A. O. Mitha) ১৯৭১ সালের মার্চ-এপ্রিলে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন। সেসময় তিনি চিটাগাং মিলিটারি হাসপাতালে পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। ড.শর্মিলা বোস জেনারেল মিঠার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবে, 'আমি তখন হাসপাতালের ওয়ার্ডের মধ্য দিয়ে হাঁটছিলাম। একজন আহত বাঙ্গালী অফিসার (সে তখন পাহারাধীন ছিল) আমাকে ডাক দিল। আমি থামলাম এবং তার দিকে গেলাম। সে বললো, আমি যা বলতে চাই তা হলো, আমি ও আমার লোকেরা পশ্চিম পাকিস্তানী মহিলাদের উলঙ্গ করেছি। তাদের ধর্ষণের পর উলঙ্গ ভাবে নাচতে বাধ্য করেছি। এসব করার পর আমি এখন মরতে পারলেও আনন্দিত।' (একথা শোনার পর) আমার কোন জবাব ছিল না। আমি চলে এলাম। -(Mitha, Major General A. O. 2003) শর্মিলা বোস লিখেছেন, "আমার গবেষণা কালে তিনজন পাকিস্তানী সেনা-অফিসার আলাদা আলাদাভাবে অবিকল অভিন্ন বিবরণ দিয়েছিল আহত সে বাঙ্গালী অফিসারটি থেকে। তাকে তারা নাম ধরে সনাক্তও করেছিল। পরে সে প্রাণে বেঁচে যায় এবং স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের এক উচ্চপদস্থ পদেও সে আসীন হয়েছিল।”

বাংলাদেশের বইপুস্তকে একাত্তরের ধর্ষণ

একাত্তরের যুদ্ধের উপর বাংলাদেশ,পাকিস্তান ও ভারতে অনেকেই বই লিখেছেন।আত্মকথা মূলক বই লিখেছেন পাকিস্তানের কিছু উচ্চপদস্থ্ সামরিক অফিসার। তবে বাংলাদেশে একাত্তরের উপর বইলেখা -শর্মিলা বোসের মতে,পরিণত হয়েছে কুঠির শিল্পে। বাংলাভাষায় লেখা বইয়ের অধিকাংশই অতি নিম্ন মানের,এবং বানোয়াট গল্পগুজবে পরিপূর্ণ। এসব বই পড়ে বিদেশী গবেষকদের হোঁচট খেতে হয়। তিরিশ লাখ নিহত এবং তিন লাখ ধর্ষিত হওয়ার মত তথ্য বাংলায় লেখা বইয়ে হাজার হাজার বার লেখা হয়েছে কোন রূপ গবেষণা না করেই। ফলে একাত্তরে কি ঘটেছে সেটির উপর সঠিক ধারণা এসব বই থেকে পাওয়া অসম্ভব। এমনকি দরিদ্র জনগণের রাজস্বের অর্থে বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত ইতিহাসের বই যে কতটা মিথ্যায় পরিপূর্ণ সে প্রমাণই কি কম? এমনকি ধর্ষণের ন্যায় গুরুতর বিষয়েও মিথ্যা কেচ্ছাকাহিনীর স্থান দেওয়া হয়েছে এ বইয়ে। তার কিছু নমুনা দেওয়া যাক। বাংলাদেশের সরকার কর্তৃক প্রকাশিত স্বাধীনতার যুদ্ধের দলীলপত্র (১৯৯৯) গ্রন্থের অষ্টম খন্ডে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে জনৈক রাবেয়া খাতুনের কথা। বাঙ্গালী মহিলাদের ধর্ষণের বিষয়ে সে যে কাহিনী বলেছে সেটিই বাংলাদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে অধিক আলোচিত বিবরণ।পরীক্ষা করে দেখা যাক সে যা কিছু বলেছে তা কতটা ভূয়া এবং কতটা বিশ্বাসযোগ্য। সে একজন নিরক্ষর মহিলা। নিজের নাম স্বাক্ষরের সামর্থ তার ছিল না। তাই তাকে টিপসই দিতে হত।রাবেয়া খাতুনের নিজের ভাষ্য অনুযায়ী সে তখন রাজারবাগ পুলিশ লাইনে ঝাড়ুদারের কাজ করতো। সেখানে সে কাজ করেছে যুদ্ধকালীন পুরো সময়টিই ধরে। তার কথা, সে নিজে ধর্ষিতা হয়েছে ২৬শে মার্চে যখন রাজারবাগ পুলিশ লাইন পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা দখল করে নেয়। এবং ধর্ষণের পর একমাত্র তাকেই একাত্তরের বাকি সময়টা ঝাড়ুদারের কাজে রাখা হয়। প্রশ্ন হলো,যে মহিলা যাদের দ্বারা ধর্ষিতা হলো তাদের অফিসে দীর্ঘ নয় মাস লাগাতর ঝাড়ুদার রূপে কাজের প্রেরণা বা মনবল পায় কোত্থেকে? সেটি যদি ধর্ষণপুরিই হয়ে থাকে এবং সেখানে অবস্থানরত সৈনিকেরা যদি ধর্ষণে এতটা বেপরোওয়া হয়ে থাকে তবে সেখানে বার বার ধর্ষিতা হওয়ার সম্ভাবনাই কি বেশী নয়? সেটি তো এক ভয়াবহ অবস্থা। যে কোন কান্ডজ্ঞান সম্পন্ন মহিলা কি সেখান থেকে যে কোন ভাবে পালাতো না? অথচ সেখানে সে দিনের পর দিন কাজ করেছে। তাছাড়া রাজারবাগ একটি বিশাল এলাকা। অনেকগুলি বিল্ডিং সেখানে। মাত্র একজন ঝাড়ুদার ৯ মাস সেখানে লাগাতর কাজ করলো সেটিইও কতটা বিশ্বাসযোগ্য?

রাবেয়া খাতুনের দাবী,সে স্বচোখে দেখেছে,সেখানে ট্রাকভর্তি করে বাঙ্গালী মহিলাদের আনা হতো, বন্দী রাখা হতো এবং মাসের পর মাস ধর্ষণ করা হতো। তবে তার এ বিবরণে কোন সংখ্যার উল্লেখ নাই এবং তারিখেরও উল্লেখ নাই। রাবেয়া খাতুনের মতে “পাঞ্জাবী সৈন্যরা মহিলাদের আনতো স্কুল,কলেজ,বিশ্ববিদ্যালয় ও অভিজাত আবাসিক এলাকা থেকে।” তাদের অধিকাংশের হাতে বই ও গায়ে অলংকার থাকতো। তার বিবরণ মতে,“পাক-সেনারা এসব মুহিলাদের চুম্বন করতো,

6 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

উলঙ্গো করত, ধর্ষণ করতো এবং নানারূপ কুরুচীপূর্ণ আওয়াজ করতো এবং মাঝে মাঝে অট্রহাসীও দিত।” সে আরো বর্ণনা দিয়েছে,“তিন তলা বিল্ডিংয়ে সারিবদ্ধ ভাবে এসব মহিলাদের উলঙ্গ করে রাখা হত। মহিলাদের মাথার চুল বারান্দায় টানানো তার ও লোহার রডের সাথে বেঁধে উলঙ্গ-অবস্থায় সারিবদ্ধ ভাবে ঝুলিয়ে দেয়া হত। পাঞ্জাবী সৈন্যরা কাজে যাওয়ার সময় এবং কাজ থেকে ফেরার সময় তাদের উপর যৌন নিপীড়ন করতো। এসব মহিলাদের মধ্যে যারা মারা যেত তাদেরকে নীচে নামিয়ে নেওয়া হত এবং উলঙ্গ মেয়েদের নতুন ব্যাচ আনা হত।” রাবেয়া খাতুনের কথা, সেখানে সব সময় পাহারাদারীর ব্যবস্থা ছিল। তবে সমস্যা হলো,সে যা বলেছে তা অন্য কাউকে দিয়ে যাচায় করার উপায় সে রাখেনি। তার কথা,সেখানে আর কোন বাঙ্গালী ছিল না,অন্য কোন ঝাড়ুদারও ছিল না। অর্থাৎ এসবের সাক্ষী একমাত্র সেই। সে আরো বলেছে,“ডিসেম্বরে যখন ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকার উপর বোমা বর্ষণ শুরু করে তখন পাঞ্জাবী সৈন্যরা সেখানে আনা জীবিত সকল মেয়েদেরকেই হত্যা করে।”

রাবেয়া খাতুনের বিবরণ যে কতটা ভূয়া ও বানোয়াট সেটি বুঝতে কি বিদ্ধাবুদ্ধি লাগে? যারা বিবেক-বর্জিত এবং গুজবে ভেসে চলা যাদের স্বভাব তাদেরকে বভেমানুষকে ৩০ লাখের তথ্যে বিশ্বাস করানো সহজ। কোটি কোটি মানুষ তো প্রানহীন মুর্তি ও শাপ-শকুনকেও দেবতা মানতে রাজী।মিথ্যাকে এভাবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে কোন সাক্ষী-প্রমাণ বা বিদ্যাবুদ্ধি লাগে না। অথচ প্রতিটি বিবেকবান ব্যক্তিই প্রতিটি অপরাধে অপরাধীকেকে খুঁজতে প্রমাণও খুঁজে। আর প্রতিটি অপরাধী সেটি রেখেও যায়।অপরাধ তা যত সাবধানতার সাথেই হোক না কেন,ঘটনাস্থলে সাক্ষী সে রেখে যাবেই। অপরাধ অনুসন্ধানকারিরা তো এ বিশ্বাস নিয়েই অনুসন্ধানে নামে।আর এটি প্রমাণিত সত্য। তাই কেউ খুণ হলো বা ধর্ষিতা হলো অথচ তার প্রমাণ নেই -সেটি ভাবা যায় না। তাই প্রশ্ন হলো্,কোন বনে জঙ্গেলে নয়, রাজধানীর কেন্দ্রে এক বিশাল পুলিশ কেন্দ্রে শত শত নারী ধর্ষিতা হল, ধর্ষণের পর তারা নিহত হল তার প্রমাণ কি একমাত্র রাবেয়া খাতুন? কোথায় সে অসংখ্য উলঙ্গ মহিলাদের লাশ বা কোথায় তাদেরকে কবর? সে তথ্য রাবেয়া খাতুন তার জবানবন্দীতে দেয়নি। ১৬ই ডিসেম্বরে বা ১৬ই ডিসেম্বরের পর কোথাও রাবেয়া খাতুনের কথিত এরূপ শত শত ধর্ষিতা উলঙ্গ মহিলাদের লাশ ঢাকার কোথাও পাওয়া যায়নি। এমনকি পাওয়া যায়নি তাদের কংকালের স্তুপও। রাবেয়া খাতুনের এ বিবরণের মূল্যায়ন করতে গিয়ে শর্মিলা বোস লিখেছেন,

“I asked an eminent Bangladeshi and a strong supporter of the liberation movement to read this account and tell me what he made of it. He opined that it was a “fabrication”, commenting that the parts about women hanging by their hair from iron rods for days on end “defied the laws of science”. That there are serious problems with this “testimony” would be obvious to any rational observer. The woman in whose name it is written was illiterate. Rajarbag was not in an isolated area but in the capital city. The descriptions of bejewelled girl students clutching books arriving by the truckloads to be stripped and raped in public, naked women lining the corridors and hanging by their hair along the verandahs, subjected to all manner of bestiality, smacks more of the perverted fantasies of a male mind than the testimony of a female eyewitness. The claim that this woman was the only Bengali and only one sweeper in Rajarbag police lines for a nine-month period is an absurdity.”

অর্থঃ আমি প্রখ্যাত এক বাংলাদেশী এবং মক্তিযুদ্ধের কঠোর সমর্থককে এ বিবরণটি পড়তে বলেছিলাম এবং তার অভিমত জানাতে বলেছিলাম।তিনি আমাকে বললেন,এটি মিথ্যা। তার অভিমত,মাথার চুল দিয়ে লোহার রডের সাথে মেয়েদেরকে দিনের পর দিন লটকিয়ে রাখার বিষয়টি বিজ্ঞানের স্বাভাবিক রীতিকেও অস্বীকার করে।তার জবানবন্দীতে যে মারাত্মক সমস্যা রয়েছে সেটি যে কোন যুক্তিবাদী মানুষের কাছেই সুস্পষ্ট। এবং যার নামে এ কথাগুলো লেখা হয়েছে সে লিখতে-পড়তে পারেনা। রাজারবাগ কোন বিচ্ছিন্ন এলাকা নয়, রাজধানীর মধ্যে এর অবস্থান। হাতে বই,গায়ে গহনা -এমন স্কুল ছাত্রীদের ট্রাক ভর্তি করে নিয়ে আসা,তাদেরকে উলঙ্গ করা,প্রকাশ্যে ধর্ষণ করা,উলঙ্গ মেয়েদেরকে সারিবদ্ধ ভাবে বারান্দায় রাখা,মাথার চুলদিয়ে তাদেরকে লোহার রডের সাথে লটকিয়ে রাখা –এগুলো পশুবৎ।এ বর্ণনার মধ্য দিয়ে যা প্রকাশ পায় তা

7 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

হলো কুৎসিত পুরুষ-মনের উদ্ভট কল্পনা,কোন নারীর স্বচোখে দেখা জবানবন্দী নয়। এবং রাজারবাগে ৯ মাস ধরে এই মহিলাটিই যে ছিল একমাত্র বাঙ্গালী এবং একমাত্র ঝাড়ুদার ছিল -বিশ্বাস করা যায় না সে দাবীটিও।” একটি মিথ্যা বললে অনেকগুলি মিথ্যা বলতে হয় সেটি প্রমাণ করতে। সেটিই প্রকান্ড ভাবে হয়েছে বাংলাদেশের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে। যেমন হয়েছে ৩০ লাখ মানুষ নিহত হওয়ার মিথ্যাটি প্রমাণ করতে,তেমনি হয়েছে তিন লাখ নারী ধর্ষিতার বিষয়টি প্রমাণ করতে। আর এভাবে ইতিহাসের বইতে স্তুপীকৃত করা হয়েছে বিশাল আবর্জনা। রাবেয়া খাতুনের সে অবিশ্বাস্য জবানবন্দীটি তাই ঐতিহাসিক দলীল রূপে স্থান পেয়েছে “বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস” নামক গ্রন্থে । এবং সেটি করা হয়েছে জনগণের কষ্টার্জিত রাজস্বের অর্থে।

বাংলাদেশের ইতিহাসে ধর্ষণের আরেক প্রমাণ রূপে খাড়া করা হয়েছে ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনীকে। শাহরিয়ার কবির তার সম্পাদিত “একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতী”বইতে তার জবানবন্দীকে দলীল রূপে পেশ করেছেন। শর্মিলা বসুর গবেষণা থেকে সে বিষয়ে কিছু জানা যাক।“ফেরদৌসী প্রিয়ভাষিনী একজন মধ্যবিত্ত শ্রেনীর শিক্ষিত মহিলা এবং পেশায় ভাস্কর। তার কাজের স্থান ছিল খুলনার এক জুটমিলের অফিসে। ফেরদৌসীর অভিযোগ তাকে প্রথমে তার আগাখানী জেনারেল ম্যানেজার ধর্ষণ করে। তারপর সে ১৫ জন পাকিস্তানী সামরিক অফিসারের নাম নেয় যাদের অবস্থান ছিল যশোর ও খুলনায়। তাদের মধ্য থেকে একমাত্র দুইজন বাদে সবার বিরুদ্ধে হয় ধর্ষণ অথবা ধর্ষণের চেষ্টা বা অন্য প্রকার যৌন নিপীড়নের অভিযোগ আনা হয়েছে যা করা হয়েছে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের নামে। তার নিজের ভাষ্য মতে সে একজন তালাকপ্রাপ্তা তিন সন্তানের মা। তার সন্তানেরা খুলনায় ফেরদৌসীর নানীর কাছে থাকতো আর নিজের মা এবং ৭ জন ভাই-বোন নিয়ে সে খালিশপুরে থাকতো।যেখানে সে জুটমিলে কাজ করতো। আহসান উল্লাহ আহমেদ নামে ফেরদৌসীর একজন পুরুষ বন্ধু ছিল এবং সে ছিল পাশ্ববর্তী আরেকটি জুটমিলের লেবার অফিসার। মিলিটারি এ্যাকশনের পর আহসান উল্লাহ তার নিজের পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যেতে বলে। ফেরদৌসীর মা এবং তার ভাই-বোনেরাও চলে যায়। তখন ফেরদৌসী একা থেকে যায় তবে মাঝেমধ্যে তার কোন ভাই বা বোন বেড়াতে আসতো। তখন তার পুরুষ প্রেমিকটি পাশেই কাজ করতো। ফেরদৌসীর যুক্তি হলো,সে ছিল পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি তাই তাকে খালিশপুরে থাকতে হয়েছিল। তার মতে যেদিন সে প্রথম ধর্ষণের শিকার হয় সেদিন সে তার ম্যানেজারের সাথে দুপুরের খানা খেতে গিয়েছিল,কাজ শেষে সে তার সাথে তার এপারমেন্টেও গিয়েছিল। এবং সেখানেই সে ধর্ষণের শিকার হয়। পরের দিন সে আবার কাজে গিয়েছিল।” এখানে প্রশ্ন হলো, যে ধর্ষণ নিয়ে একাত্তরের পর সে এতবড় জবানবন্দী পেশ করলো এবং ইতিহাসের বইযে প্রকান্ড সাক্ষীতে পরিণত হলো,যেদিন সে ধর্ষিতা হলো সেদিন তার নিজের আচরণটি কেমন ছিল? সে যখন ধর্ষিতা হওয়ার মুখে তখনও সে বাধা দেয়নি। প্রতিবাদও করেনি। ধাক্কাধাক্কি করে সে ধর্ষণ থেকে বাঁচবার বা পলায়নেরও চেষ্টা করেনি। যেখানে ধর্ষণকারি হলো স্বয়ং ম্যানেজার,সে স্থান কোন অবস্থাতেই তার জন্য নিরাপদ ছিল না। অথচ সে বিপদজনক স্থান থেকে সেদিন বা পরের দিন পলায়নও করেনি। পরবর্তী নয় মাসেও সে পলায়নের চেষ্টা করেনি। বরং পরের দিন আবার সে অফিসেই কাজে গেছে। অথচ কোন অবস্থাতেই এ বিশ্বাস করা যাবে না যে ফেরদৌসী বন্দী ছিল। নিরাপদ স্থানে সে চলে যেতে পারতো। ফেরদৌসী ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে গুলজারিন নামে একজন ন্যাভাল কমান্ডারের বিরুদ্ধে। শর্মিলা বসু লিখেছেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অন্যান্য অফিসারগণও গুলজারিনকে চারিত্রিক দিকদিয়ে সন্দেহজনক মনে করতো। কিন্তু সে অফিসারটির সাথে ফেরদৌসী একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল এ মর্মে যে তার সাথে সে থাকবে না,তবে যখনই ডাকবে তখনই সে আসবে।

ইতিহাসচর্চার নামে মিথ্যাচারের আরেক উদাহরণ দেওয়া যাক জনৈক আখতারুজ্জামানের জবানবন্দী থেকে।তার সে জবানবন্দী দলিল রূপে স্থান পেয়েছে রশিদ হায়দারের সম্পাদিত “ভয়াবহ অভিজ্ঞতা” বইতে। (Rashid Haider, 71) আখতারুজ্জামানের মতে সে ছিল একজন মুক্তিযোদ্ধা, সে ভারতীয় বাহিনীর সাথে ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বরে পূর্ব পাকিস্তানের উত্তর সীমান্তে ভুরুঙ্গমারিতে হামলায় অংশ নিয়েছিল। এখানে ভারত সরকারের মিথ্যাচারিতাও ধরে পড়ে। তাদের দাবী, ভারতীয় সেনাবাহিনী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তেসরা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে -যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে।একই বক্তব্য বাংলাদেশের ভারতপন্থিদেরও। এবিষয়টি নিয়ে বাংলাদেশের কোন গবেষক গবেষণা না করলেও অনুসন্ধান করেছেন দুইজন মার্কিনী গবেষক Sission and Rose। তারা তাদের গবেষণা মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সকল সীমান্ত দিয়ে ভারতীয় বাহিনীর অভিযান শুরু হয় ২১শে নভেম্বর।(Sission and Rose, 1990)। তবে তার আগেও ভারতীয় বাহিনীর হামলা স্থানে স্থানে হত তার প্রমাণ অনেক। ১৯৭১ সালের ১১ নভেম্বরে ভুরুঙ্গমারিতে হামলা তারই এক উদাহরণ। আখতারুজ্জামানের বর্ণনায় প্রমাণিত হয়, এসব হামলা পরিচালিত হতো ভারতীয় সেনাবাহিনীর দ্বারা, মুক্তিবাহিনীর সদস্যারা থাকতো তাদের সাহায্যকারি রূপে। হামদুর রহমান কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় বাহনীর কাছে ভুরঙ্গমারির পতন ঘটে ১৪ই নভেম্বর, ১৯৭১ সালে।– (Hamoodur Rehman Commission (HRC) Report of Inquiry into the 1971 War)। ভুরঙ্গমারির তিন

8 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

দিকেই ভারত। আখতারুজ্জামান মন্ডলের ভাষ্য মতে ভারতীয় সেনাবাহিনী হামলা করে উত্তর,পূর্ব ও পশ্চিম দিক দিয়ে।হামলায় ব্যবহৃত হয় ভারি কামান, নেওয়া হয় বিমান বাহিনীর সহযোগীতা। ১৪ই নভেম্বর ভুরঙ্গমারিতে পাকিস্তানি বাহিনী নীরব হয়ে যায়, মন্ডল এবং তার সাথীরা সেখানে প্রবেশ করে। এক বিধ্বস্ত বাংকারে সে দেখে পাকিস্তানী আর্মির ক্যাপ্টেন আতাউল্লাহ খানের লাশ।তার পাশেই দেখে ক্ষত-বিক্ষত এক বাঙ্গালী মহিলার লাশ। তার কথায়,মদখোর সে পাশব ক্যাপ্টেনটি তার বাহু দিয়ে জড়িয়ে ধরে ছিল সে বাঙ্গালী মহিলাকে। সে নিহত হয়েছিল এ অবস্থাতেই। মহিলাটিকে একজন কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী বা কোন শিক্ষিত গৃহবধু বলে মনে হচ্ছিল। তার সমগ্র দেহজুড়ে সে পাশবিক দানবের অত্যাচারের চিহ্ন ছিল। আকতারুজ্জামান মন্ডলের বক্তব্য কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য তা নিয়ে শর্মিলা বোস অনুসন্ধান করেছেন। একাজে তিনি পাকিস্তানে গেছেন এবং সংশ্লিষ্ট সেনা অফিসারদের সাথে সাক্ষাতকার নিয়েছেন। শর্মিলা বসের গবেষণার ফলাফল ও সে সাথে তার নিজস্ব অভিমত হলো নিম্নরূপঃ

“Mandal does not say that he had ever heard of Captain Ataullah Khan before his dead-body was discovered after the battle. Therefore, it is not clear on what basis he describes the dead officer as “alcoholic” or of “bad character”, nor how he makes suppositions about the dead woman’s profession or education, or of marks of “torment” on her body, especially as he says that both bodies were severely mutilated by the bombing. According to Mandal’s own account, the Pakistani captain and his men had been fighting a ferocious attack by the Indian army for two days and three nights. The captain had been killed in that battle. The insinuation that he was partying in a bunker at the same time beggars belief.

According to one his fellow officer, Captain Ataullah had not been in Bhurungamari before – he was based at Nageshwari. He had barely got there when he was faced with the Indian attack, which went on all night, the next day and the following night. Remnants of the company who were retreating towards Nageshwari reported that Captain Ataullah was dead. This fellow officer of 25 Punjab described Captain Ataullah as a six-foot plus Pathan officer known for being “humane”. He stated that he saw people in Nageshwari weep upon hearing of Captain Ataullah’s death. According to him, when the Pakistanis were POWs in India after the war, a senior Indian officer had expressed his respect, soldier-to-soldier, to the officers of 25 Punjab, and mentioned by name Ataullah, who had become a ‘shaheed’ (martyr).

The picture painted of Captain Ataullah by this fellow of-ficer, who knew him, completely contradicts the one given by Mandal, who appears to have only seen his dead body. Clearly, if Captain Ataullah had been based in Nageshwari and only gone up to Bhurungamari the day that the Indian attack started, he could not have been responsible for whatever might have been going on in Bhurungamari. Mandal offers no corroborat-ing evidence for his character assassination of an officer who had died defending his country, and therefore, cannot speak in his own defence. (Bose S, Economic and Political Weekly September 22, 2007).

যুদ্ধাপরাধও যখন পুরস্কৃত হয়

লক্ষণীয় হলো, একাত্তরের উপর বাংলাদেশীদের লেখালেখিতে বাঙ্গালীদের অপরাধ কর্মের বিবরণ নেই। বরং যেটি নজরে পড়ে সেটি হলো, এ অপরাধীদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী রূপে চিত্রিত করার প্রচেষ্ঠা। স্বাধীন বাংলাদেশে আওয়ামী ক্যাডারগণ হাজার হাজার জনতার উপস্থিতিতে ঢাকা স্টেডিয়ামে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে নিরস্ত্র রাজাকার হত্যাকে

9 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

উৎসবের কাজ মনে করে, –যেমনটি কাদের সিদ্দিকী ও সহযোগীরা করেছিল। এটি ছিল সুস্পষ্ট যুদ্ধাপরাধ। অথচ সে যুদ্ধাপরাধী কাদের সিদ্দিকীকেই একজন বীর রূপে ভূষিত করা হয়েছে। যে আওয়ামী ক্যাডারগণ যাত্রীভর্তি বাসে আগুন দিতে পারে (যেমন ঢাকার রাজপথে ঘটেছিল নব্বইয়ের দশকে), যারা লগি-বৈঠা নিয়ে পিটিয়ে মুসল্লি হত্যা করতে পারে (যেমনটি ২০০৬ সালে ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের পাশের রাস্তায় ঘটেছিল), তারা যে আটকে পড়া অসহায় অবাঙ্গালী মহিলাদের উপরে বলাৎকারে ঝাপিয়ে পড়বে ও তাদেরকে হত্যা করবে সেটি কি স্বাভাবিক নয়? ড. নীলিমা ইব্রাহীম তার বইয়ে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে যৌন অত্যাচারের অভিযোগ তুলেছেন। এ নিয়ে বিতর্ক নেই, একাত্তরে বহু বাঙ্গালী যেমন নিহত হয়েছে, তেমনি বহু বাঙ্গালী মহিলা ধর্ষিতাও হয়েছে। তবে এটুকু লেখা হলেই ইতিহাসের সবটুকু লেখা হয় না। একাত্তরের ইতিহাসের আরো অনেক সত্য ঘটনা আছে। অবাঙ্গালীদের উপরও যে নির্যাতন হয়েছে, এবং অসংখ্য অবাঙ্গীলা মহিলাও যে বাঙ্গালীদের হাতে ধর্ষণের শিকার হয়েছে সেটিও তো ইতিহাসের অংশ। অথচ নীলিমা ইব্রাহীমের রচনায় সে বিবরণ নেই। অথচ তিনি মানবাধিকারের কথা বলেন। মানবাধিকার কি শুধু একটি বিশেষ বর্ণ ও একটি বিশেষ ভাষাভাষি মানুষের জন্য? ইজ্জত নিয়ে প্রাণে বাঁচার অধিকার তো সবার। যেমন বাঙ্গালীদের তেমন অবাঙ্গালীদেরও। পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্বীকার করে নিয়েছে যে তাদের দ্বারা হত্যা ও ধর্ষণ দু’টোই হয়েছে। কিন্তু বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের লেখায় সে বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকু কই? সভ্য ও সত্যনিষ্ঠ মানব রূপে বেড়ে উঠার জন্য এ বুদ্ধিবৃত্তিক সততাটুকুই কি নূন্যতম প্রয়োজন নয়? আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীগণই শুধু নয়, তাদের বুদ্ধিজীবী ও লেখকগণ অবাঙ্গালীদের সে মানবিক অধিকার দিতে রাজি হয়নি। তাদেরও দিতে রাজী নয় যারা সেদিন অখন্ড পাকিস্তানের সমর্থক ছিল। একাত্তরের মার্চের শুরু থেকে ২০শে এপ্রিল পর্যন্ত সমগ্র পূর্ব পাকিস্তান ছিল তাদের দখলে। আর সে সময় সে মানবাধিকার আস্তাকুঁড়ে গিয়ে পড়েছিল। তখন হত্যা ও নারীধর্ষণ ঘটেছে প্রচন্ড বীভৎসতা নিয়ে।

একাত্তরে প্রতিহিংসার যে বিষাক্ত বিষ বাঙ্গালীর চেতনায় ঢুকানো হয়েছিল তা এখন মহা বিষবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। আর সে বৃক্ষের গোড়ায় লাগাতর পানিও ঢালা হচ্ছে। ফলে অসম্ভব হয়ে অবাঙ্গালী মুসলমানদের সাথে মিলে অভিন্ন উম্মাহ গড়ার চেতনা। বরং দেশটি দিন দিন আরো গভীর ভাবে কাফের শক্তির কোলে গিয়ে পড়ছে।একাত্তরে ভারতপন্থিদের লক্ষ্য বাঙ্গালী মুসলমানদের শুধু ভৌগলিক ভাবে অবাঙ্গালী মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন করা ছিল না,ছিল মানসিক ভাবে বিচ্ছিন্ন করাটিও। মুসলিম উম্মাহর বিচ্ছিন্ন ভৌগলিক মানচিত্র তো এভাবেই স্থায়ীত্ব পায়। সমগ্র উপমহাদেশ জুড়ে আধিপত্য বিস্তারের স্বার্থে ভারতের জন্য সেটি অপরিহার্যও ছিল। ১৯৪৭ সালে তারা মুসলমানদের মাঝে সে তিক্ততা সৃষ্টিতে বিফল হয়েছিল। কিন্তু বিপুল সফলতা পেয়েছে একাত্তরে।এখন সে বিজয়টিকেই তারা ধরে রাখতে চায়। উপমহাদেশের অবাঙ্গালী মুসলমান বলতে ৩০ লাখের খুণি ও ২ লাখ নারীর ধর্ষণকারি -এ পরিচয়টি তারা বাঙ্গালী মুসলমানদের মনে দৃঢ়মূল করতে চায়। ফলে যে মিথ্যাচর্চাকে তারা সত্তরের দশকে প্রচন্ডতা দিয়েছিল এখনও সেটিই লাগাতর চলছে। ফলে অতীতের ন্যায় আজও প্রচন্ডতা পাচ্ছে সত্যধর্ষণ এবং মিথ্যা ইতিহাসচর্চা। আর এমন মিথ্যাচর্চায় বাড়ছে নৈতিক বিপর্যয়। নয় মাসের একটি যুদ্ধে কোন দেশ ধ্বংস হয় না। তলাহীন ভিক্ষার ঝুড়ি বা দূর্নীতিতে বিশ্ব-শিরোপাও পায় না।ইরান ৮ বছরের লাগাতর যুদ্ধেও দুর্বল হয়নি। তলাহীন ঝুড়িও হয়নি। দূর্নীতি শিরোপাও পায়নি। পাকিস্তান তো ১৯৬৫ ও ১৯৭১য়ে দুটি প্রকান্ড যুদ্ধের পরও আণবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। অথচ বাংলাদেশের নীচে নামা এখনও শেষ হলো না। কথা হলো,মিথ্যাচর্চা যদি দেশে লাগাতর চলে তাতে দেশবাসীর পক্ষে কি সঠিক পথে চলা সম্ভব? নীচে নামা তথা সংকটের দিকে ধাবিত হওয়াই কি তখন স্বাভাবিক নয়? মহান আল্লাহতায়ালা বলেছেন,জায়াল হাক্ব ওয়া জাহাকাল বাতিল,ইন্নাল বাতিলা কানা জাহুকা।” অর্থঃ সত্য আসলো এবং মিথ্যা দূরীভূত হল। এবং নিশ্চয়ই মিথ্যা দূরীভূত হওয়ার জন্যই। এবং কোরআনের এ আয়াতটি ঘোষিত হয়েছিল মুসলমানদের হাতে মক্কা বিজয়ের পর।এ আয়াতের মূল শিক্ষাটি হলো,ইসলাম আসলে মিথ্যা দূরীভূত হবেই।অর্থাৎ আঁধার দূর করতে আলো লাগবেই।অর্থ দাড়ায়,মিথ্যার আবর্জনা সরাতে হলে সত্যকে বিজয়ী করতে হবেই। কিন্তু বাংলাদেশে হয়েছে তার উল্টোটি। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমানের দেশের আইন-আদালত,শিক্ষা-সংস্কৃতি ও অর্থনীতির ময়দানসহ রাষ্ট্রীয় জীবনের প্রতিক্ষেত্রে আজ পরাভূত ও দূরীভূত হওয়ার পথে ইসলামী শিক্ষা,বিধান ও মূল্যবোধ।রাতের আঁধার যেমন দিগন্ত জুড়ে ছেয়ে যায় তেমনি ছেয়ে গেছে মিথ্যাচার। ইসলাম ও ইসলামপন্থিগণ আজ সেদেশে সর্বার্থে পরাজিত শক্তি। কোন রকমে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে আছে মসজিদের চার দেয়ালের মাঝে। দেশটিতে বিজয়ী শক্তি হলো মিথ্যা ও মিথ্যার প্রাকটিশনাররা। ফলে আজও প্রবল ভাবে বেঁচে আছে ৩০ লাখ হত্যা ও ২ লাখ ধর্ষণের মিথ্যাচার। কথা হলো,এমন মিথ্যাচারে ঈমান আনা এবং সে মিথ্যাটির উচ্চারণই যদি প্রতিদিনের অভ্যাসে পরিণত হয় তবে কি সে মিথ্যুকের মনে আল্লাহর উপর ঈমান ও তাঁর সত্যদ্বীন গ্রহণের সামর্থও কি বাঁচে? আলো ও আঁধার তো একসাথে চলে না। তেমনি একসাথে চলে না সত্যের প্রতিষ্ঠা ও মিথ্যাচর্চা । নানা মিথ্যার ন্যায় বাংলাদেশে যে ভাবে ৩০ লাখ হত্যা ও ২ লাখ ধর্ষণের মিথ্যাচারটি প্রকান্ড ভাবে বেঁচে আছে সেটি তো মিথ্যারই বিজয়-নিশান।মিথ্যাকে এভাবে বাঁচিয়ে রেখে আল্লাহর সত্যদ্বীনের চর্চা ও তার বিজয়ও

10 / 11

একাত্তরে নারীধর্ষণ ও সত্যধর্ষণ

Written by ফিরোজ মাহবুব কামাল
Saturday, 21 November 2009 23:35 - Last Updated Wednesday, 23 February 2011 21:35

কি সুনিশ্চিত করা যায়? কিন্তু সে ভাবনা কি বাংলাদেশের মুসলমানদের আছে?

Reference

1. Hamoodur Rehman Commission (HRC) Report of Inquiry into the 1971 War (Vanguard Books Lahore, 513).
2. Mitha, Major General A O (2003): Unlikely Beginnings: A Soldier’s Story, Oxford University Press, Karachi.
3. Niazi, Lt Gen AA K (2002): The Betrayal of East Pakistan, Oxford University Press, Karachi.
4. Estimate of Richard Helms, CIA director, in a White House meeting on March 6 and 26, 1971 (FRUS, Vol XI, 11 and 25).
5. Web site of Liberation War Museum, Dhaka. The claims of “genocide” of three million Bengalis and the alleged rape of hundreds of thousands of Bengali women are usually clubbed together.
6. Bose, Sarmila: “Problems of Locating Sexual Violence in the 1971 War:The Problem of Numbers” Economic and Political Weekly September 22, 2007
7. Ferdousi Priyabhashini in Shahriar Kabir (ed) (1999): Ekattorer Duhsaha Smriti, Ekattorer Ghatok Dalal Nirmul Committee, Dhaka.
8. Sisson, Richard and Leo Rose (1990): War and Secession: Pakistan, India and the Creation of Bangladesh, University of California, Berkeley.
9. Rashid Haider (ed), 1971: Akhtaruzzaman, ‘Amaderi ma-bon’; Bhayabaha Abhignata, Sahitya Prakash, Dhaka, 1996.

11 / 11